আজকের কাগজ

তারিখ 14 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সন্ত্রাস কবলিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ নিরাপত্তার সন্ধানে

আজকের কাগজ

আবদুল খালেক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুব ঘন ঘন পত্র-পত্রিকায় সংবাদের শিরোনাম হিসেবে স্থান করে নিচ্ছে। সে শিরোনাম শিক্ষা সংক্রান্ত কোন সাফল্য বা কৃতিত্বের জন্য নয়, শিরোনাম পাচ্ছে মারামারি , হানাহানি, সন্ত্রাস এবং রক্তপাতের জন্য। বিগত কয়েক বছরে ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ছাত্রের প্রাণহানী ঘটেছে, দেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনটি ঘটেনি। সন্ত্রাসের সর্বশেষ শিকার শেরে বাংলা হলের ছাত্র 'রিমু চৌধুরী'। ১৮ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র হামলায় 'রিমু চৌধুরী' প্রাণ হারায়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর অন্যান্য বারের মত এবারেও সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এবারের দুর্ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেশের বাইরে অবস্থান করছিলেন। তিনি দেশে ফিরে এসে তড়িঘড়ি করে সিন্ডিকেটের জরুরী সভা ডেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার এক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উপাচার্য মহোদয়ের ইচ্ছের প্রতিফলন আমরা সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তে লক্ষ্য করেছি। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ অক্টোবর থেকে যথারীতি ক্লাস শুরু হবার কথা।

'রিমু' হত্যার পর মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক জরুরী সভায় মিলিত হয়। উক্ত সভায় শিক্ষক সমিতির সকল সদস্য 'রিমুর' হত্যাকান্ডে প্রচন্ড ক্ষোভ, তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা জানিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আর কোন ছাত্রের লাশ ক্যাম্পাসে দেখতে চায় না। এ ব্যাপারে দেশের সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। যতদিন ক্যাম্পাসের শিক্ষক, ছাত্র এবং কর্মচারীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা না যাবে, ততদিন শিক্ষকগণ তাঁদের সকল রকমের দায়িত্ব পালন থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবেন। শিক্ষক-কর্মচারীদের চোখের সামনে যখন হত্যাকান্ডগুলো সংঘটিত হয়, সে ক্ষেত্রে তাঁরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেন না। তাঁদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব আছে এবং সেই দায়িত্ববোধ থেকেই এবার শিক্ষক সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় খুলবার আগেই দেশের সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ক্যাম্পাস, জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং নিশ্চয়তা দাবী করে। অথচ উপাচার্য মহোদয় বিদেশ থেকে ফিরে এসে শিক্ষক সমিতির সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা ছাড়াই সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় কাস্টিং ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া এবং ছেলে-মেয়েদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের নয়, এবারের দুর্ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও নিদারুণ নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। প্রভোস্ট, রেজিষ্ট্রার এবং ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের ওপর হামলা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে কোন হত্যাকান্ডেরই প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই ক্যাম্পাসে কোন হত্যাকান্ড সংঘটিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় কিছুকাল বন্ধ রেখে উত্তেজনা প্রশমনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনা এবং ছাত্র হত্যার তালিকা বেশ দীর্ঘ। রিমু হত্যার পর সমগ্র দেশ জুড়ে যে প্রতিক্রিয়া এবং উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলবার সময় অবশ্যই তা হিসেবের মধ্যে রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গক্রমে সেই হিসেবটাই করা যাক।

১৮ সেপ্টেম্বর ইসলামী ছাত্রশিবির বহিরাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জামাত কর্মীদের সাহায্যে গভীর রাতে বিভিন্ন হলে ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিল। এ কথা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। জামাত-শিবিরের সশস্ত্র আক্রমণের মুখে তাদের প্রতিপক্ষ কোন ছাত্র সংগঠনই রুখে দাঁড়াতে সমর্থ হয়নি, একে একে হল ছেড়ে পালিয়েছে। 'মাদার বখস হল' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুর্জয় ঘাঁটি বলে পরিচিত। কিন্তু জামাত-শিবিরের আক্রমণে মাদার বখস হলেরও পতন ঘটে। ছাত্রদল তাদের হলের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে শেরেবাংলা হলের ছাত্র 'রিমু' শিবিরের আক্রমণে নিহত হয়েছে। এই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে শিবিরের প্রতিপক্ষ উত্তেজিত ছাত্রবৃন্দ শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়ে এবং উপ-উপাচার্যের বাসায় প্রচন্ড হামলা চালায়। উত্তেজিত ছাত্রদের হামলায় উপ-উপাচার্য আহত হন। উপ-

উপাচার্যের সাথে শিবিরের একটি গোপন সম্পর্ক আছে, সম্ভবত; এই ধারণা থেকেই উত্তেজিত ছাত্ররা তাঁর ওপর আক্রমণ চালায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে কখনও এমনটি ঘটেনি।

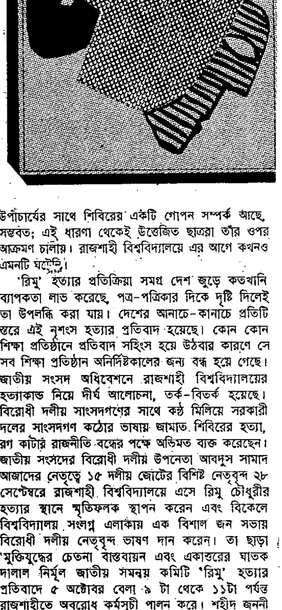

'রিমু' হত্যার প্রতিক্রিয়া সমগ্র দেশ জুড়ে কতখানি ব্যাপকতা লাভ করেছে, পত্র-পত্রিকার দিকে দৃষ্টি দিলেই তা উপলব্ধি করা যায়। দেশের আনাচে-কানাচে প্রতিটি স্তরে এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ হয়েছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবাদ সহিংস হয়ে উঠবার কারণে সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। জাতীয় সংসদ অধিবেশনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকান্ড নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। বিরোধী দলীয় সাংসদগণের সাথে কন্ঠ মিলিয়ে সরকারী দলের সাংসদগণ কঠোর ভাষায় জামাত শিবিরের হত্যা, রগ কাটার রাজনীতি বন্ধের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোটের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ২৮ সেপ্টেম্বরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে রিমু চৌধুরীর হত্যার স্থানে স্মৃতিফলক স্থাপন করেন এবং বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এক বিশাল জন সভায় বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ ভাষণ দান করেন। তা ছাড়া 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি 'রিমু' হত্যার প্রতিবাদে ৫ অক্টোবর বেলা ৯ টা থেকে ১১টা পর্যন্ত রাজশাহীতে অবরোধ কর্মসূচী পালন করে। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সাথে রাজশাহীর হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবরোধ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। এরপর সাহেব বাজারে জাতীয় সমন্বয় কমিটির যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও প্রতিবাদী জনতার ঢল নামে।

সব কিছু মিলিয়ে রাজশাহীতে শিবির বিরোধী আন্দোলন এখন তুঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কিন্তু শহরে প্রতিদিন শিবির বিরোধী মিছিল বের হচ্ছে। 'রিমু'র হত্যাকান্ড বিরোধী দলীয় সমস্ত ছাত্র সংগঠনকে এক কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। সমগ্র দেশ জুড়ে গড়ে উঠেছে "সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ।" 'রিমু' ছাত্র মৈত্রীর কর্মী হলেও সে প্রকৃতপক্ষে বিএনপি পরিবারের সন্তান। আর সে কারণে এই হত্যাকান্ড বিএনপি তথা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকেও বেদনাভারাক্রান্ত করে তুলেছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির আজ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। এই অগ্নিপরীক্ষায় শিবির তার অব্যাহত বিজয়কে ধরে রাখবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৯২ সালের ১৭ মার্চে 'লতিফ হল' বিধ্বস্ত

করা, এ বছরের ৬ ফেব্রুয়ারিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়নের বেশ কিছু ছাত্রকে হত্যার মাধ্যমে 'শিবির প্রমাণ করেছে শক্তির মহড়ায় সে পিছিয়ে নেই। ১৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনার মধ্যেও শিবির তার শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। এই শক্তিকে সংহত করা এখন তার মূললক্ষ্য।

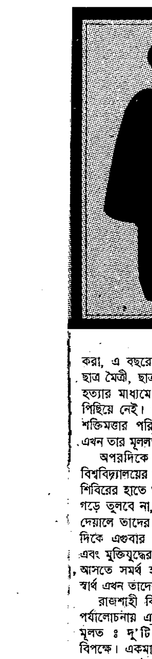

অপরদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলসহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলো একের পর এক শিবিরের হাতে শুধু মার খেয়ে যাবে, কোন রকম প্রতিরোধ গড়ে তুলবে না, এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। দেয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গেছে। এবার তাদের সামনের দিকে এগুবার পালা। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মনোভাব এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাদেরকে এক কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। দলীয় সংকীর্ণতা অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থ এখন তাদের কাছে অনেক বড়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ছাত্ররা এখন মূলত ঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং বিপক্ষে। একমাত্র ইসলামী শিবির ছাড়া সবাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। কাজেই এবার শিবিরকে এককভাবে লড়তে হবে। শিবিরের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ। এই রকম একটা যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতির মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রাখা সমস্যার কোন সমাধান নয়। এ কথা আমরা মানি, তবে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নৈতিক দায়িত্ব, সে কথাও ভুলে গেলে চলবে না। পিতা-মাতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে লেখা-পড়ার জন্য পাঠিয়ে থাকেন, লাশ হয়ে ফিরে যাবার জন্য নয়। যাঁর সন্তান লাশ হয়ে ফিরে যায়, তিনিই বুঝতে পারেন সন্তান হারানোর বেদনা কত তীব্র কত গভীর।

দেশের সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আন্তরিক প্রয়াস থাকলে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না, এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে যে বেড়া ক্ষেতের ফসল খায়, ক্ষেতের সে ফসল যেমন রক্ষা করা যায় না, তেমনি যে প্রশাসন সন্ত্রাসকে মদদ যোগায়, লালন করে, সে প্রশাসন দ্বারা সন্ত্রাস দমন অসম্ভব। কাজেই বলা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস দমন তথা ক্যাম্পাসের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের মূলশর্ত প্রশাসনের আন্তরিকতা। বিশ্ববিদ্যালয় খুলবার প্রাক্কালে দেশের সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক হতে আহবান জানাই। প্রশাসন যদি সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে কিছু পথ-নির্দেশ করা যেতে পারে।

(১) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম পরিবেষ্টিত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস শুধু আভ্যন্তরিণ নয়, আশপাশের গ্রাম থেকেও সন্ত্রাস পরিচালিত হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় যাঁরা নিয়োজিত, গ্রামগুলোর কোথায় সন্ত্রাসীরা আস্তানা গড়েছে, অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছে, অস্ত্র মওজুদ করেছে, সে তথ্য তাঁদের অজানা থাকবার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে আশপাশের গ্রামগুলোকে আগে অস্ত্রমুক্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীগণের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাবে, কারণ সন্ত্রাসীদের হাতে গ্রামবাসীগণ ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনেকটা জিম্মি হিসেবে কাজ করছে। সরকার এ ব্যাপারে তৎপর হলে গ্রামবাসীগণ সাহস পাবে এবং সন্ত্রাস দমনে এগিয়ে আসবে।

(২) ক্যাম্পাস জীবনের নিরাপত্তা বিধানে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা অপরিহার্য। কাজলা, বিনোদপুর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেইটকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব।

(৩) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালাবেন, তখন সবগুলো হল থেকে একযোগে অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে এ ক্ষেত্রে কোন রকম পক্ষপাতমূলক আচরণ করা যাবে না।

(৪) একটি হল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রভোস্ট এবং হাউস টিউটরদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের সব রকম যোগ্যতা থাকবার কথা নয়। দলীয় ভিত্তিতে নয়, যোগ্যাতার ভিত্তিতে প্রভোস্ট এবং হাউস টিউটর নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রভোস্ট যেভাবে হলের ছাত্রদের নিরাপত্তা দিতে পারবেন, নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন, উপাচার্যকে তোষামোদকারী ব্যক্তিত্বহীন কোন প্রভোস্টের পক্ষে ছাত্রদের ওপর সেই নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব নয়। প্রভোস্ট এবং হাউস টিউটর নিয়োগের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় দলীয়করণ-নীতি অনুসৃত হওয়ায় হল প্রশাসনে প্রায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সন্ত্রাস দমন এবং ছাত্রদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) সন্ত্রাস এবং ছাত্র রাজনীতিকে একই সমান্তরাল রেখায় স্থান দেয়া ঠিক নয়। সন্ত্রাস সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতির চরম শত্রু। কাজেই ছাত্র রাজনীতি সন্ত্রাসকে কখনো প্রশ্রয় দিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সন্ত্রাস দমনে আন্তরিকতা এবং নিরপেক্ষতার সাথে ছাত্রদের সহযোগিতা চাইলে ইতিবাচক সাড়া না পাবার কথা নয়, কারণ অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী সন্ত্রাসের বিপক্ষে। ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করে সন্ত্রাস দমনের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন নীতিমালা করতে গেলে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পাবার আশংকা আছে।

(৬) সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-কর্মচারীর সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। দলমত নির্বিশেষ সকল শিক্ষক-কর্মচারীর একজন আস্থাভাজন উপাচার্য ছাড়া এই সম্পৃক্তকরণ সম্ভব নয়।

কাজেই সবকিছু মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে সন্ত্রাস দমন এবং নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সুতরাং এ মুহূর্তে প্রয়োজন ১৯৭৩ সালের গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিনেটের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীর আস্থাভাজন একজন উপাচার্য নিয়োগ, সন্ত্রাস দমন এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য এর কোন বিকল্প নেই।

আবদুল খালেক ঃ প্রফেসর বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।